# সাংখ্য দর্শন

## (Sankhya Philosophy)

ভারতীয় দর্শন শাখাগুলির মধ্যে সবচেয়ে প্রাচীন দর্শন হল সাংখ্য দর্শন। এই দর্শনের মূল প্রবক্তা হলেন কপিল মুনি। কপিল মুনির শিষ্য প্রশিষ্য যথা - বাচস্পতি, গৌড়পদ, ঈশ্বরকৃষ্ণ, পঞ্চশিখ প্রমুখের চেষ্টায় এই দর্শন আরও খ্যাতিলাভ করে। সংখ্যা থেকে সাংখ্যা শব্দটির উদ্ভব। আবার কারো কারো মতে সাংখ্য কথাটির অর্থ হল সম্যক জ্ঞান। যে শাস্ত্র সম্যক জ্ঞান নিয়ে আলোচনা করে তাকে বলে সাংখ্য দর্শন। সাংখ্য দর্শন বিশ্বাস করে প্রতিটি কার্যের পিছনে কোন না কোন কারণ থাকবেই। অর্থাৎ কারণ ব্যতিরেকে কোন কার্য সম্পন্ন সম্ভব নয়। যেমন - বীজের মধ্যে নিহিত থাকে ভবিষ্যত উদ্ভিদের সম্ভাবনা, আবার সুতো আছে বলেই তো কাপড় উৎপন্ন সম্ভব, মাটি আছে বলেই মৃৎপাত্র নির্মাণ সম্ভব হয়েছে। শূন্য থেকে কিছুই সৃষ্টি হয় না। প্রতিটি কার্যের পেছনে কারণের অস্তিত্ব নিহিত থাকে, অর্থাৎ কার্য ও কারণ একে অপরের পরিপূরক।

### সাংখ্য অধিবিদ্যা

সাংখ্য অধিবিদ্যায় চারপ্রকারের তত্ত্বকে স্বীকার করা হয়েছে। যথা - প্রকৃতি বলতে বোঝায় শব্দ, বাচ্য, মূল, প্রকৃতি। প্রকৃতি হল সত্ত্ব, রজ ও তম গুণের সাম্য অবস্থা। সাংখ্য দর্শনে অন্যতম আকার গ্রন্থ "সাংখ্য কারিকায়" বলা হয়েছে যে যা অন্য সকল তত্ত্বের উপাদান কিন্তু অন্য কিছুর বিকার ও কার্য নয়, তাই হল মূল প্রকৃতি। তাছাড়া প্রকৃতি সকল কার্যে আদি কারণ হিসেবেও পরিচিত। প্রকৃতি-বিকৃতি হল মহৎ, অহংকার, শব্দ, রূপ, রস, স্পর্শ ও গন্ধ এই সাতটি তত্ত্ব। এগুলি কার্য কারণ উভয়ই প্রকৃতি থেকে মহৎ, মহৎ থেকে অহংকার এবং অহংকার থেকে পঞ্চতনমাত্র (রূপ, রস, গন্ধ, স্পর্শ, শব্দ) এগুলি অনুযায়ী প্রকৃতির পরিমাণ হবে।

বিকৃতি বা কার্য ষোলোটি তত্ত্ব যথা - পঞ্চজ্ঞানেন্দ্রিয়, পঞ্চকর্মে ইন্দ্রিয়, পঞ্চমহাভূত ও মনের সমষ্টি এগুলি কখনও প্রকৃতি বা কারণ হতে পারে না।

অনুভয় রূপ — অনুভয় রূপে বলা হয়েছে যা প্রকৃতিও নয় আবার বিকৃতিও নয় এমন কিছুকে। "সাংখ্য কারিকায়" পুরুষকে অনুভয় রূপ বলা হয়েছে। কারণ পুরুষ কার্য বা কারণ হয় না আবার পুরুষ হল নির্বিকার ও নিষ্ক্রিয় তত্ত্ব।

### সাংখ্যমতে জ্ঞানতত্ত্ব

সাংখ্য মতে মানুষের জানার কাজটি সম্পন্ন হয় প্রমার তিনটি উৎসকে স্বীকার করে। এগুলি হল প্রত্যক্ষ, অনুমান ও শব্দ।

সাংখ্য দর্শনে প্রমা কোন বস্তুর বিশেষ ও সত্য জ্ঞান। সাংখ্য এই জানার প্রক্রিয়াকে একটু অন্যভাবে বিশ্লেষন করে। সব প্রমান তিনটি উপাদান আবশ্যিক অঙ্গ-একটি হল প্রমাতা, যে জানছে, দ্বিতীয়টি হল প্রমেয় অর্থাৎ যা জানা যাচ্ছে। আর প্রমাণ হল জানার উৎস। সাংখ্যদর্শনে বুদ্ধি অচেতন। সেইবুদ্ধি যখন ইন্দ্রিয়ের সাহায্যে বিষয়ের সাথে যুক্ত হয়ে কাজ করে তখনই মানুষের চৈতন্য জাগ্রত হয়। আত্মার চেতনাংশে বুদ্ধির প্রতিফলনের সাহায্যে মানুষ কোন কিছুকে জানতে পারে। এই জানা বস্তু ইন্দ্রিয়, মনস্তত্ত্ব বুদ্ধি এই ধাপগুলি অনুসরন করে চলে। বুদ্ধির

এই প্রতিফলনের ফলে মানুষ এই বস্তুটি সম্পর্কে জ্ঞানলাভ করে। এই জ্ঞানলাভের প্রক্রিয়াটি যে পর্যায়ক্রমিক ধাপে সংগঠিত হয়। তা হল সাহায্যে প্রথমত, ইন্দ্রিয় বাহুর সংস্পর্শে আসে, দ্বিতীয়ত এই সংযোগের ফলে ইন্দ্রিয় গুলিতে একটি চাপ পড়ে। তৃতীয়ত, মন বুদ্ধি একে বিশ্লেষন করে। চতুর্থত, বুদ্ধি যে স্বরূগত অচেতন, তাই বিষয়টিকে সরাসরি জানতে পারে না, কিন্তু বিষয়ের আকারে আকারিত হয়। বুদ্ধিতে সাত্ত্বিক গুন থাকার বদলে তা আত্মার চেতন অংশে প্রতিফলিত হয়, ও শেষে বুদ্ধির প্রতিফলনের সাহায্যে আত্মা বস্তুটিকে জানে।

## সাংখ্য দর্শনের অধিবিদ্যা

### প্রত্যক্ষ

প্রত্যক্ষ দুধরনের - নির্বিকল্প ও সবিকল্প।

নির্বিকল্প প্রত্যক্ষ ইন্দ্রিয় ও বস্তুর সংযোগ থেকে উৎপন্ন হয়। এই প্রত্যক্ষ একেবারেই সংবেদন বাক্যে একে প্রকাশ করা যায় না। এই অবস্থাকে আলোচনা বলা হয়। শিশুর যেমন বিষয় বা বস্তু সম্পর্কে সংবেদন হয়, কিন্তু প্রকাশ করতে পারে না বিষয়টির নির্দিষ্ট স্বরূপ, তেমনি নির্বিকল্প প্রত্যক্ষেও শুধু সংবেদন হয়। দ্বিতীয় অবস্থা হল সবিকল্প প্রত্যক্ষ। এই প্রত্যক্ষে বিষয়টি সম্পর্কে জ্ঞাতার পূর্ণ জ্ঞান হয়, তখন সে বলতে পারে - 'এটি একটি টেবিল', 'এটি বই' প্রভৃতি।

### অনুমান

জগতের দ্বিতীয় উৎস হল অনুমান, সাংখ্য দর্শনমতে কার্যকারনের অবিচ্ছেদ্য সম্পর্কের সূত্র ধরে আমরা প্রত্যক্ষ থেকে অপ্রত্যক্ষ পৌঁছাই। যেমন আমরা আগুন ও ধোঁয়ার একটি অবিচ্ছিন্ন সম্পর্ক সবসময় দেখেছি। তাই যখনই ধোঁয়া দেখছি তখনই আগুনের অস্তিত্ব অনুমান করছি। এই অনুমান সদর্থক ও নেতিবাচক হতে পারে।

### শব্দ

সাংখ্য মতে শব্দ আর একটি প্রমান বা প্রমানর উৎস। সাংখ্য দার্শনিকেরা বেদ ভিত্তিক শব্দ ছাড়া আর কোনো শব্দের প্রামান্য স্বীকার করেন না।

সাংখ্য অধিবিদ্যায় চার প্রকার তত্ত্ব বা প্রতিপাপ্ত বিষয়কে স্বীকার করা হয়েছে। যথা i) প্রকৃতি ii) প্রকৃতি-বিকৃতি iii) বিকৃতি iv) অনুভয় রূপ (প্রকৃতিও নয়, বিকৃতিও নয়)

প্রকৃতি বলতে বোঝায় শব্দবাচ্য মূল প্রকৃতি। মূল প্রকৃতি, কোন তত্ত্বের বিকার বা কার্ণকে চিহ্নিত করে না। প্রকৃতি হল সত্ত্ব, রজ: এবং তম: গুণের সাম্যবস্থা, সাংখ্য দর্শনের অন্যতম আকার গ্রন্থ 'সাংখ্যকারিকায়' বলা হয়েছে যে, যা অন্য সকল তত্ত্বের উপাদান কিন্তু অন্য কিছুর বিকার বা কার্য নয়। তাই হল মূল প্রকৃতি সকল কাজ প্রকৃতিতে অব্যক্ত অবস্থায় থাকে তাই প্রকৃতি অব্যক্ত। আবার প্রকৃতির কোন কারণ নেই বলে অকারণ, তাছাড়া প্রকৃতি সকল কার্যের আদি কারণ হিসেবেও পরিচিত।

প্রকৃতি-বিকৃতি হল মহৎ, অহংকার, শব্দ, স্পর্শ, রূপ, রস ও গন্ধ — এই সাতটি তত্ত্ব। এগুলি কারণ ও কার্য উভয়ই। প্রকৃতি থেকে মহৎ, মহৎ থেকে অহংকার এবং অহংকার থেকে পঞ্চ তন্মাত্র (শব্দ, স্পর্শ, রূপ, রস ও গন্ধ) এই ক্রমানুযায়ী প্রকৃতির পরিণাম ঘটে।

বিকৃতি বা কার্য হল ষোলটি তত্ত্ব যা পঞ্চ জ্ঞানেন্দ্রিয় (চক্ষু, কর্ণ, নাসিকা, জিহ্বা, ত্বক), পঞ্চকর্মেন্দ্রিয় (বাক্, পাণি, পাদ, পায়ু ও উপস্থ) পঞ্চমহাভূত (ক্ষিতি, অপ্, তজ, মরুৎ ও ব্যোম) এবং মন-এর সমষ্টি। এগুলি কখনও প্রকৃতি বা কারণ হতে পারে না।

অনুভয়রূপ বলা হয়েছে যা প্রকৃতিও নয় বিকৃতিও নয় এমন কিছুকে। আবার সাংখ্য করিকায় পুরুষকে অনুভয়রূপ বলা হয়েছে। কারণ পুরুষকারোর কার্য বা কারণ হয় না। আবার পুরুষ হল নির্বিকার ও নিষ্ক্রিয় তত্ত্ব। সাংখ্য দার্শনিকদের মতে প্রকৃতিই হল জগতের আদি উপাদান ও অধিষ্ঠান। প্রকৃতির পরিনামের ফলে জগতের সৃষ্টি ও লয় দুই ই ঘটে থাকে। সত্ত্ব, রজঃ ও তমঃ গুনের সাম্যবস্থা যখন সৃষ্টি হয় তখন প্রকৃতির যে পরিনাম দেখা যায় তাকে স্বরূপ পরিনাম বলে। আবার প্রকৃতি একদিকে যেমন সর্বব্যপী অসীম, অতিসূক্ষ ও জড়শক্তি হিসাবো চিহ্নিত অপরদিকে ইহা তেমনি চৈতন্যধম্য রহিত।

সাংখ্য অধিবিদ্যায় কার্যকরন তত্ত্বটি 'সৎকার্যবাদ' নামে পরিচিত, উৎপন্ন বস্তুকে কার্য বলা হয় এবং যা থেকে ঐ কার্য উৎপন্ন হয় তাকে কারন বলা হয়। কারন ও কার্য পরস্পর ভিন্ন হলেও 'সৎ'। উৎপত্তির পূর্বে কার্য কারনই বর্তমান থাকে। আবার কার্যের মধ্যে কারনের যথার্থ ও বাস্তব পরিনাম ঘটে। কার্যের সম্ভবনা কারনে অপ্রকাশিত অবস্থায় থাকে। পরে তা প্রকাশিত হয়। জগৎ কারণ প্রকৃতিতে জগৎ সৃষ্টির পূর্বে অনভিব্যক্ত অবস্থান করে, সৃষ্টির মাধ্যমে তার অভিব্যক্তি হয়ে থাকে। ইন্দ্রিয়ের উপর প্রভাব বিস্তার করে, এরপর মন ও বুদ্ধির দ্বারা বিশ্লেষণ চলতে থাকে। আত্মার চেতনাংশে বুদ্ধির প্রতিফলনের সাহায্যে বস্তুটির জ্ঞান লাভ করে। যেমন - আমরা আগুন ও ধোঁয়ার সম্পর্ক সবসময় দেখেছি। তাই যখনই ধোঁয়া দেখি তখন আগুনের অস্তিত্ব অনুমান করি। এই অনুমান সদর্থক বা নঞর্থক (নেতিবাচক) হতে পারে। সাংখ্য মতে শব্দটি আরেকটি প্রমাণ বা প্রমার উৎস। সাংখ্য দার্শনিকরা বেদভিত্তিক শব্দ ছাড়া আর কোন শব্দের প্রামাঙ্ক স্বীকার করে না।

## সাংখ্য নীতিতত্ত্ব

সাংখ্য মতে এই জগত ও জীবন দুঃখময়, তাই সাংখ্য দর্শনকে দুঃখবাদীও বলা হয়। তবে জগতে সুখ ও আনন্দ নেই তা নয়, সুখ ও আনন্দ উভয়ই আছে তবে তা অস্থায়ী। সাংখ্য দর্শনে দুঃখকে তিনটি ভাগে ভাগ করা হয়েছে। যেমন - জীবহত্যা, সর্পাঘাত, ইত্যাদির ফলে যে দুঃখ অনুভব হয় তাকে বলে আধিভৌতিক। ভূত, প্রেত ইত্যাদি অতিন্দ্রীয় বিষয় দ্বারা যে দুঃখের সৃষ্টি হয় তাকে বলে আধিদৈবিক, ঈশ্বর থেকে যে দুঃখের সৃষ্টি হয় তা হল আধ্যাত্মিক।

সমস্ত মানুষই দুঃখ থেকে মুক্তি পেতে চায় এবং সারা জীবন ধরে আনন্দ পেতে চায়। সাংখ্য দার্শনিকগণ বলেছেন যে, মানুষ যতদিন শরীর ধারণ করবে ততদিন তার দুঃখ থাকবে অর্থাৎ দুঃখভোগ মানুষের স্বভাব কিন্তু এই দুঃখভোগ থেকে মুক্তি লাভ কীভাবে সম্ভব যে সম্পর্কে সাংখ্য দার্শনিকগণ বলেছেন, যে তত্ত্বজ্ঞানই হল দুঃখ থেকে মুক্তি লাভের প্রধান উপায়। তত্ত্বজ্ঞান বলতে বোঝায় প্রকৃতি ও পুরুষের ভেদকে উপলব্ধি করা।

## আধুনিক শিক্ষাদর্শনে সাংখ্য দর্শনের প্রাসঙ্গিকতা

শিক্ষাক্ষেত্রে বর্তমানে সাংখ্য দর্শনের যে প্রভাব রয়েছে বা শিক্ষাতত্ত্বে সাংখ্য দর্শনের যে প্রাসঙ্গিকতা রয়েছে তা হল নিম্নরূপ:

1. শিক্ষার লক্ষ্য নির্ধারণেও সাংখ্য দর্শনের প্রাসঙ্গিকতা রয়েছে। আত্মার মুক্তি ও আত্মপোলব্ধিতে সাহায্য করে এই দর্শন। তাছাড়া শিশুর দৈহিক, বৌদ্ধিক ও নৈতিক অর্থাৎ এককথায় ব্যক্তিসত্ত্বার বিকাশসাধন এই শিক্ষার লক্ষ্য, যা বর্তমানের শিক্ষাতেও স্বীকৃত।

2. শিক্ষাদান পদ্ধতির ক্ষেত্রে আত্মজ্ঞান অর্জনের জন্য দক্ষতার প্রয়োজন বলে এই দর্শন মনে করে, আর এর জন্য প্রয়োজন তিন ধরনের প্রমাণ অর্থাৎ প্রত্যক্ষ, সিদ্ধান্ত ও শব্দের।

3. প্রকৃত জ্ঞান যাতে লাভ হয় সেইসব বিষয়ের উপর গুরুত্ব দেওয়া হয়েছে এই দর্শনে। তাই এই দর্শন অনুযায়ী পাঠক্রমে বিভিন্ন ধরনের বিষয় থাকবে তা বলাই বাহুল্য।

4. এই দর্শন অনুযায়ী শিক্ষকের ভূমিকাও যথেষ্ট গুরুত্বপূর্ণ। কারণ শিক্ষক একদিকে শিক্ষার্থীর জ্ঞানার্জনে সাহায্য করবে আর একদিকে প্রকৃতসত্ত্বা ও অপ্রকৃত সত্ত্বার মধ্যে পার্থক্য অনুধাবনে সাহায্য করবেন।

5. এই দর্শন ব্যক্তিস্বাধীনতা ও আত্মশৃঙ্খলার উপর যথেষ্ট গুরুত্ব প্রদান করে।

6. শিক্ষার্থীর মধ্যে আত্মমুক্তির জন্য যথেষ্ট প্রেষণা থাকবে। তারা জীবনমুক্তি সম্পর্কে যথেষ্ট জ্ঞানের অধিকারী হবে।

## উপসংহার বা মন্তব্য

সাংখ্য দর্শনে যথেষ্ট প্রভাব পরিলক্ষিত হয়। এই দর্শনে আত্মার পার্থক্য অনুযায়ী আত্মার বহুত্বতত্ত্বকে প্রাধান্য দেওয়া হয়েছে। শিক্ষাক্ষেত্রে কর্মমুখীনতার তাৎপর্য সাংখ্য দর্শনে খুঁজে পাওয়া যায়। বিজ্ঞানীদের ন্যায় এই দর্শন মনে করে যে সবসময় সকল কারণের মধ্যে কার্যের সম্ভাবনা লুকিয়ে থাকে। সুতরাং শিক্ষাক্ষেত্রে প্রতিটি ব্যক্তির প্রকৃতি অনুযায়ী পাঠক্রম রচনার কথা বলা হয়েছে। তাই শিক্ষাক্ষেত্রে এই দর্শনের গুরুত্ব ও প্রভাবকে কখনোই অস্বীকার করা যায় না।

# যোগ দর্শন
# (Yoga Philosophy)

আদর্শ জীবন যাপনের উপায় ও পদ্ধতি একমাত্র যোগ দর্শনে বিশদভাবে বর্ণনা করা হয়েছে। এই দর্শনশাস্ত্রের প্রথম প্রণেতা হলেন **পতঞ্জলি**। যোগ দর্শন হল সাংখ্য দর্শনের ব্যবহারিক দিক। এই দর্শনের মূল বক্তব্য হল **জীবনের সকল যন্ত্রণা থেকে আত্মার মুক্তি**। এরা বৈদিক বলে ঈশ্বরের অস্তিত্বকে স্বীকার করে। আবার যেহেতু এই দর্শন সাংখ্য দর্শনকে অনুকরণ করেছে তাই এরা প্রত্যক্ষ, অনুমান ও শব্দজ্ঞানকে প্রমাণ হিসেবে স্বীকার করে। আবার যেহেতু এই দর্শন সাংখ্য দর্শনকে অনুকরণ করেছে তাই এরা প্রত্যক্ষ, অনুমান ও শব্দজ্ঞানকে প্রমাণ হিসেবে স্বীকার করে।

এই দর্শন সাংখ্য দর্শকের অধিবিদ্যা ও জ্ঞানবিদ্যকে স্বীকৃতি দিয়েছে এবং প্রায়োগিক পথ অনুসরণ করে কীভাবে মুক্তিলাভ করা যায় সে ব্যাপারে সুচিন্তিত মতামত ব্যক্ত করেছে। **আবার জগত সৃষ্টির উৎস হিসেবে প্রকৃতি ও পুরুষ উভয়তে** স্বীকৃতি দেয় বলে ইহা সাংখ্য দর্শনের ন্যায় দ্বৈতবাদী দর্শন।

যোগ দার্শনিকদের মতে, যখন চিত্ত বা বুদ্ধি মনের মাধ্যমে কোন বস্তুর সঙ্গে সংযুক্ত হয় তখনই সেই বস্তুর আকার গ্রহণ করে। বুদ্ধি বা চিত্তে এই আকারের মাধ্যমে বস্তু সম্পর্কে জ্ঞান জন্মায়। আবার আত্মার কোন পরিবর্তন বা বিকার না থাকলেও প্রতিফলনের জগৎ তাকে চিত্তবৃত্তির মত পরিবর্তনশীল বলে মনে হয়। তাই এই দর্শনে পাঁচ ধরনের চিত্তবৃত্তির কথা বলা হয়েছে। যেমন —

(i) প্রমা বা জ্ঞান — যোগ দর্শনে জ্ঞানের তিনটি উৎসের কথা বলা হয়েছে প্রত্যক্ষ, অনুমান ও শব্দ।

(ii) ভ্রান্তজ্ঞান — ইহা বলতে বিপর্যয় বা সংশয়কে বোঝায়।

(iii) বিকল্প — যে শব্দের অর্থ দ্বারা কোন বস্তুর বস্তু বোঝায় না সেই শব্দ দ্বারা যে জ্ঞান জন্মায় তাই হল বিকল্প।

(iv) স্মৃতি — কোন পরিবর্তন না ঘটিয়ে অভিজ্ঞতার পুনঃপ্রকাশের নামই হল স্মৃতি

(v) সুষুপ্তি — ইহা বলতে স্বপ্নহীন নিদ্রাকে বোঝান হয়েছে।

**যোগ নীতিবিদ্যা**

যোগ দর্শনে চিত্তবৃত্তি নিরোধের উপায় নির্দেশ করা হয়েছে। চিত্ত সত্ত্ব, রজ: ও তম: গুণ দ্বারা গঠিত। অপরদিকে চিত্তভূমি, চিত্তের অবস্থা। চিত্তভূমির স্তর, সত্ত্ব-রজ: ও তম গুণের যে কোন একটি বা দুটির প্রাধান্য অনুসারে বিন্যস্ত হয়। চিত্তের অবস্থাকে পাঁচটি স্তরে ভাগ করা হয়েছে — ক্ষিপ্ত, মূঢ়, বিক্ষিপ্ত, একাগ্র ও নিরুদ্ধ। এর মধ্যে প্রথম তিনটির অবস্থা যোগের পক্ষে অনুকূল।

যোগ দর্শনে অন্যতম উপজীব্য বিষয় হল চিত্তবৃত্তির নিরোধ, আত্মার কোন বিকল্প না থাকলেও চিত্তবৃত্তিতে প্রতিফলিত হওয়ার জন্য আত্মাকে চিত্তবৃত্তি ন্যায় পরিবর্তনশীল মনে হয়। আবার অজ্ঞানতার জন্য চিত্তবৃত্তিকে আত্মার বিকার বলে মনে হয়। ফলে আত্মার ক্লেশ দ্বার ক্লিষ্ট হয়। ক্লেষ হল আবার পাঁচ প্রকার —

(i) অজ্ঞান (অনিত্যকে নিত্য বলে ভাবা এবং অনাত্মাকে আত্মা বলে ভুল করা)

(ii) অস্মিতা (আত্মাকে বুদ্ধি, মন ইত্যাদির সঙ্গে অভিন্ন বলে গন্য করা হয়)

(iii) রাগ (সুখভোগের ইচ্ছে)

(iv) দ্বেষ (দুঃখ বিরোগ)

(v) অভিনিবেশ (সর্বজীবে মৃত্যু ভয়)

এই ক্লেশগুলির আসল কারণ হল অবিদ্যা। অবিদ্যা দূর করার অর্থই হল চিত্তবৃত্তির নিরোধ এবং আত্মার স্বরূপে অবস্থান করা।

সপ্রজ্ঞাত সমাধিতে সাধক ধীরে ধীরে স্থূল বস্তু থেকে তন্মাত্রা, ইন্দ্রিয়, অহংবোধের দিকে এগিয়ে যায়। এই সাধনা দীর্ঘস্থায়ী হলে সাধক সমস্ত বন্ধন থেকে মুক্ত হবে। আত্মজ্ঞানে নিবিষ্ট হবে এবং কামনা-বাসনা থেকে মুক্ত হবে। এইভাবে সুপ্রজ্ঞাত সমাধি বিভিন্ন স্তরের/মাধ্যমে অগ্রসর হয়। চিত্ত যখন সকল প্রকার বিষয় চিন্তা থেকে মুক্ত হবে পর্যায়ের তখন অসামঞ্জস্য সমাধি লাভ হয়। যোগ দার্শনিকদের মতে, অতীত ও বর্তমান সকল কর্মফলের বিনাশ হলে অসম্প্রজ্ঞাত সমাধিতে চিরপ্রতিষ্ঠিত হওয়া যায় এবং তার জন্য সাধনার প্রয়োজন। যোগ দর্শনে সাধনার জন্য বা আটটি পথের নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। যথা -

(i) যম — কয়েকটি ব্রত পালনকে আবশ্যকীয় বলা হয়েছে, অহিংসা, সত্য কথা বলা, সৎ চিন্তা করা, চুরি না করা, ইন্দ্রিয় দমন, বিনা প্রয়োজনে অন্যের দান গ্রহণ না করা ইত্যাদি যম সাধনার অন্তর্ভুক্ত।

(ii) নিয়ম — নিয়ম বলতে কতগুলি উচ্চস্তরগুণ সম্পন্ন আচরণ অনুশীলন করাকে বোঝায়। যেমন - স্নানের দ্বারা দেহশুদ্ধি, সাত্ত্বিক আহার গ্রহণ। সকলের জন্য শুভকামনা অন্যের দোষ সম্পর্কে ঔদাসীন্য, ধর্মগ্রন্থ পাঠ, ঈশ্বরের কাছে আত্মসমর্পন প্রভৃতি।

(iii) আসন — আসন বলতে বোঝায় শরীরের বিভিন্ন অঙ্গাপ্রত্যঙ্গের স্বাস্থ্যসম্মত ভঙ্গি, এর দ্বারা আমাদের সকলের দেহ ব্যধিমুক্ত হয়।

(iv) প্রাণায়াম — ইহা বলতে বোঝায় বিশেষ উপায় শ্বাস প্রশ্বাসের নিয়ন্ত্রণকে। এর ফলে সামগ্রিকভাবে একাগ্রতা বৃদ্ধি পায়।

(v) প্রত্যাহার — মন যখন অন্তর্মুখী হয় তখন বিভিন্ন ইন্দ্রিয়কে তাদের বিষয় থেকেও প্রতিনিবৃত্ত করা যেতে পারে। এই প্রক্রিয়াই প্রত্যাহার হিসেবে পরিচিত।

(vi) ধারণা — ধারণা বলতে বোঝায় দেহের বিশেষ কোন অঙ্গে মনোনিবেশ করা।

(vii) ধ্যান — কোন বিষয়ের উপর অবিরাম চিন্তায় নিবিষ্ট থাকা কে এই দর্শনে ধ্যান বলা হয়।

(viii) সমাধি — যোগ দর্শনে বর্ণিত অষ্টাঙ্গিক মার্গের শেষ ধাপটি হল সমাধি। এই অবস্থায় সত্য উপলব্ধির জন্য যোগী বিষয়বস্তুতে এতই নিবিষ্ট চিত্ত হয় যে তার চেতনা তখন আর থাকে না।

যোগ দর্শনের অষ্টাঙ্গিকমার্গের মধ্যে পাঁচটি ব্যক্তির চিত্তকে সমাধির জন্য প্রস্তুত করে বলে এগুলিকে একত্রে বলা হয় বহিরঙ্গসাধন। শেষ তিনটি মার্গ হল ধারণা, ধ্যান, সমাধি। চিত্তবৃত্তি, নিরোধের সঙ্গে প্রত্যক্ষভাবে সংযুক্ত বলে একে বলা হয় অন্তরঙ্গসাধন।

**যোগ দর্শনের শিক্ষাক্ষেত্রে প্রাসঙ্গিকতা**

শিক্ষার বিভিন্ন দিক যেমন — শিক্ষার লক্ষ্য, পাঠক্রম, পদ্ধতি, শিক্ষক প্রভৃতি সব ক্ষেত্রেই যোগ দর্শনের কমবেশী প্রভাব পরিলক্ষিত হয়। যেমন —

ক) শিক্ষার লক্ষ্য নির্ধারণে — শিক্ষার্থীর চরিত্র গঠনে ও ব্যক্তিসত্ত্বার যথার্থ বিকাশ সাধন, মানবিক গুণাবলীর বিকাশসাধন, জ্ঞানেন্দ্রিয়র প্রশিক্ষণ, মনের নিয়ন্ত্রণ তথা ধ্যান ইত্যাদি শিক্ষার লক্ষ্য হওয়া উচিত বলে এই দর্শন মনে করে।

খ) পাঠক্রম নির্ধারণে — শিক্ষার্থী যাতে সমস্ত মানসিক চাপ জয় করে শান্তিতে জীবন যাপন করতে পারে তার জন্য যোগের নীতি, ধ্যান, প্রাণয়ম, প্রভৃতি বিষয়ে পাঠক্রম থাকলে সুফল পাওয়া যেতে পারে।

গ) পদ্ধতি — সাংখ্য দর্শনের ন্যায় যোগ দর্শনে শিক্ষাদান পদ্ধতি হিসাবে জ্ঞানলাভের তিনটি প্রমাণ প্রত্যক্ষ, সিদ্ধান্ত ও শব্দের উপর জোড় দেওয়া হয়েছে এবং বিভিন্ন প্রায়োগিক পদ্ধতিগুলি অনুসরণের কথা বলা হয়েছে।

ঘ) শৃঙ্খলা — যোগ দর্শনে আত্মশৃঙ্খলার উপর জোড় দেওয়া হয়েছে যাতে শিক্ষার্থী প্রকৃত জ্ঞান লাভ করতে পারে।

ঙ) শিক্ষক — শিক্ষক হবেন আদর্শবাদী জ্ঞানী যাকে শিক্ষার্থীরা অনুসরণ করবে এবং মুক্তির যথার্থ পথ সম্বন্ধে অবহিত হবেন।

**মন্তব্য**

সুতরাং যোগ দর্শনের মূল বক্তব্য হল সুস্থ শরীর ও মন গঠন। তাই সারা বিশ্বে যৌগিক প্রক্রিয়াগুলি অনুশীলনের মাধ্যমে শরীর ও মনকে সুস্থ রাখার কথা বলা হয়েছে। প্রকৃত শিক্ষার কাজ হল মানুষকে শারিরীক ও মানসিক যন্ত্রণা থেকে মুক্ত রাখা ও সংস্কারমুক্ত হতে তাকে সহায়তা করা। ইহাই এই দর্শনের মূল বক্তব্য। এর জন্য ঋষি অরবিন্দ বলেছেন, "**সমস্ত জীবনই যোগ।**" মনকে আকাঙ্খিত কোন বিষয়কে যুক্ত রেখে প্রতিকর্মে নিজেকে যুক্ত রাখাই হল যোগ দর্শনের উদ্দেশ্য।

গান্ধিজী তার শিক্ষণ চিন্তায় যোগ দর্শনের অন্যতম দিক **অহিংসাকে** সর্বাধিক গুরুত্ব দিয়েছেন। স্বামী বিবেকানন্দ শিক্ষার্থীদের মধ্যে শৃঙ্খলা আনার জন্য **ব্রহ্মচর্য** পালনের নির্দেশ দিয়েছেন। এমনকী অভিজ্ঞতাবাদী দার্শনিক জন লক্ বলেছেন, "**সুস্থ দেহেই সুস্থ মনের আধার**"। তার জন্য তিনি বিদ্যাচর্চার সঙ্গে শরীরচর্চার ও গুরুত্ব দিয়েছেন। তাই শিক্ষা ক্ষেত্রে যোগ দর্শনের উপযোগীতা সমানভাবে প্রাসঙ্গিক।

# ন্যায় দর্শন
# (Nyaya Philosophy)

যে শাস্ত্রের মাধ্যমে প্রমা এবং প্রমাণের সঙ্গে যুক্ত কোন নির্দিষ্ট পদ্ধতির সাহায্যে নিশ্চিত সিদ্ধান্তে পৌঁছানো যায়, তাকেই ন্যায়শাস্ত্র বলে। এই শাস্ত্রের দর্শন মূলত বুদ্ধি এবং ক্ষমতার উপর নির্ভরশীল। যুক্তি, সিদ্ধান্ত, চিন্তা বা বিচারের প্রণালী নির্দেশ করাই হল এর কাজ। সুতরাং যে প্রণালীর দ্বারা কোন নিশ্চিত সিদ্ধান্তে পৌঁছানো যায় তাকেই বলে ন্যায়। ন্যায় দর্শনের প্রতিষ্ঠাতা হলেন - গৌতম মুনি বা মহর্ষি গৌতম। যিনি অক্ষপাদ নামে পরিচিত। সেইজন্য এই দর্শন অক্ষপাদ দর্শন হিসেবেও চিহ্নিত। এই দর্শন প্রধানত 'প্রমা' ও 'প্রমাণের' উপর নির্ভরশীল। আবার অনুমানিত ন্যায় দর্শন আরেকটি প্রমাণ অর্থাৎ প্রমার উৎস হিসেবে স্বীকার করে ন্যায় শাস্ত্রের মূল লক্ষ্য হল সার্বিক জ্ঞান আহরণের মধ্যে দিয়ে মোক্ষরূপ বা পুরুষার্থ লাভ করা।

## ন্যায় দর্শনের জ্ঞানতত্ত্ব

ন্যায় দার্শনিকগণ জ্ঞান এবং জ্ঞেয় বস্তুর অস্তিত্ব স্বীকার করে নিয়েছেন। তাদের মতে জ্ঞান ও বুদ্ধি সমার্থক। মহর্ষি গৌতমের মতে, বুদ্ধি, উপলব্ধি ও জ্ঞান ভিন্ন পদার্থ নয়, জ্ঞান জীবের মধ্যেই উৎপন্ন হয়। জ্ঞানের ক্ষেত্রে আত্মা জ্ঞাতা রূপে, পদার্থ বিষয়রূপে এবং মন ও ইন্দ্রিয়াদিকে কারণ হিসেবে বিবেচনা করা হয়। পদার্থের উপস্থিতিতে পদার্থের জ্ঞানকে বলে অনুভব, অনুভব যখন বস্তু বা বিষয়ের অনুরূপ হয় তখন তাকে বলে 'প্রমা'। অপরদিকে অনুভব বস্তুর অনুরূপ না হলে তাকে বলে 'অপ্রমা'।

আবার ন্যায় দর্শনে চারপ্রকার অনুভব বা প্রমার কথা বলা হয়েছে। যেমন - প্রত্যক্ষ, অনুমান, উপমান ও শব্দ। যে জ্ঞান আমরা সরাসরি উপলব্ধি করতে পারি না তা হল অপ্রমাজ্ঞান অর্থাৎ যে জ্ঞানে সংশয়, সম ও তর্ক জড়িয়ে থাকে তাকে বলে অপ্রমাজ্ঞান। সুতরাং অপ্রমার তিনটি উৎস — সংশয়, ভ্রম ও তর্ক। কোন জ্ঞান সত্যি কি মিথ্যা তা নির্ভর করে কর্মে কতখানি সফলতা বা বিফলতা এসেছে তার উপর।

ন্যায় দর্শনের জ্ঞান তত্ত্বে বলা হয় বস্তুকে না দেখে তার উপস্থিতি যদি অনুভবের সমকক্ষ হয় তা হলেও সত্য জ্ঞান সম্ভব। ন্যায় দর্শনে এরূপ অনুভবকে প্রমা বলে। মানুষের ইন্দ্রিয়গুলিকে যদি জ্ঞান আহরণের এক একটি দ্বার হিসেবে চিহ্নিত করা হয় তবে বলা হয় ওই দ্বার বা ইন্দ্রিয়গুলি বস্তুর সঙ্গে যুক্ত হলে তবে বস্তুটি সম্বন্ধে প্রত্যক্ষ জ্ঞান লাভ সম্ভব হয়।

বস্তুর অস্তিত্ব সম্বন্ধে নিশ্চিত হওয়ার ব্যাপারটি আবার প্রয়োগবাদী দর্শনের মত। ন্যায় মতে প্রত্যক্ষ দুধরনের লৌকিক ও অলৌকিক। লৌকিক প্রত্যক্ষ দুধরনের — বাহ্য প্রত্যক্ষ ও আন্তর প্রত্যক্ষ দেহের মাধ্যমে আত্মা নিজ উদ্দেশ্য সাধন করে। চার্ককগন বলেন মন-ই-আত্মা। কিন্তু ন্যায় মতে মন আত্মা নয়। মন হল অন্তর ইন্দ্রিয়, যার সাহায্যে আত্মার বিভিন্ন মানবিক অবস্থা গুলির প্রত্যক্ষ করে। আমরা চক্ষু, কর্ণ, নাসিকা, জিহ্বা ও ত্বক এই পাঁচটি বহিঁইন্দ্রিয়ের দ্বারা যা প্রত্যক্ষ করি তা হল বাহ্যপ্রত্যক্ষ। আর অতীত ন্দ্রিয় বা মন দিয়ে যা প্রত্যক্ষ করি তা হল বাহ্যপ্রত্যক্ষ। আর অতীত ইন্দ্রিয় বা মন দিয়ে যা প্রত্যক্ষ করি তা হল মানস প্রত্যক্ষ ও অন্তর প্রত্যক্ষ।

## ন্যায় নীতিতত্ত্ব

ন্যায় দর্শনে আত্মা হল সর্বব্যাপী বিভু পদার্থ, আত্মা হল নিরাবয়ব, এর উৎপত্তি নেই বিনাশও নেই। জীবাত্মা ও পরমাত্মা ভেদে আত্মা দুপ্রকার। পরমাত্মা হলেন ঈশ্বর, ইনি হলেন জগতের নিয়ন্তা, এর উৎপত্তি ও বিনাশ নেই। ভারতীয় দর্শনে জীবাত্মা সম্পর্কে চারধরনের মতবাদ প্রচলিত আছে। যেমন —

**চার্বাকগণ** বলেছেন - দেহই আত্মা, কিন্তু মৃত দেহে আত্মার অনুপস্থিতি দেখে দেহ ও আত্মা এই চার্বাকী যুক্তি গ্রহণযোগ্য নয়। এর পরিপ্রেক্ষিতে **নৈয়াইকগণ** বলেছেন, চৈতন্য দেহের ধর্ম নয়, ইহাই আত্মার ধর্ম।

বৌদ্ধগণ বলেন, পরিবর্তনশীল মানসিক অবস্থার ধারা বা বিজ্ঞান হল আত্মা। নৈয়ায়িকগন বলেন যে আত্মাকে স্মৃতি ও প্রত্যাভিজ্ঞার সাহায্যে ব্যাখ্যা করা যায় না।

অদ্বৈত বেদান্তবাদীরা বলেন, আত্মা বিশুদ্ধ ও চৈতন্য স্বরূপ কিন্তু জ্ঞাতা ও জ্ঞেয় বস্তুর সঙ্গে সম্পর্কহীন বিশুদ্ধ চৈতন্যকে স্বীকার করা যায় না। সুতরাং চেতনা ও আত্মা এক নয়। চৈতন্য আত্মার একটি অখন্ড গুন।

## ন্যায় অধিবিদ্যা

ন্যায় দার্শনিকগণ জ্ঞানবিদ্যা ও যুক্তিবিদ্যা আলোচনার সাথে সাথে অধিবিদ্যা সম্পর্কেও কম বেশী আলোচনা করেছেন। স্বভাবতই পদার্থ, জগত, জীব, আত্মা, ঈশ্বর, মোক্ষ ইত্যাদি সম্পর্কিত আলোচনাকে তারা খুব একটা উপেক্ষা করেননি, ন্যায় দর্শন ও বৈশেয়িক দর্শন বেশ কিছু ক্ষেত্রে কাছাকাছি বলে এদের **সমান তন্ত্র** বলা হয়। বৈশেষিকগণ সাতটি পদার্থের অস্তিত্বকে স্বীকার করেছেন, সেখানে নৈয়ায়িকগন ষোলটি পদার্থ যেমন **প্রমাণ, প্রমেয়, সংশয়, প্রয়োজন, দৃষ্টান্ত, সিদ্ধান্ত, অবয়ব, তর্ক, নির্ণয়, বাদ, জল্প, বিতন্ডা, হেতাভ্যাস, ছল, জাতি ও নিগ্রহস্থান** এর অস্তিত্বের কথা বলেছেন। এই ষোলোটি পদার্থ সম্বন্ধে তত্ত্বজ্ঞান হলেই মোক্ষলাভ সম্ভব বলে তারা মত প্রকাশ করেছেন।

আবার ন্যায় মতে আত্মা হল দ্রব্য যা দেহ, মন ও ইন্দ্রিয় থেকে ভিন্ন আত্মা হল জ্ঞানের আধার। আত্মাতে জ্ঞান সর্বদা থাকে না, উপযুক্ত কারণের উপস্থিতিতে আত্মাতে জ্ঞানের উৎপত্তি হয়। আত্মা আবার দুপ্রকার — জীবাত্মা ও পরমাত্মা। জীবাত্মা হল বদ্ধ আত্মা, অপরদিকে ঈশ্বর হলেন পরমাত্মা। দেহ ও ইন্দ্রিয়াদির সঙ্গে যুক্ত হয়ে আত্মা জগতের সঙ্গে যুক্ত হয়ে সম্বন্ধযুক্ত হয়। এই সম্বন্ধের জন্য আত্মা সুখ ও দুঃখ ভোগ করে। আর সুখ দুঃখ ভোগের নিবৃতি হল মোক্ষ। সত্য জ্ঞানের দ্বারা মিথ্যাজ্ঞান বিনষ্ট না হলে মোক্ষলাভ সম্ভব নয়। ন্যায় দর্শনে মোক্ষলাভের উপায় হিসেবে শ্রবণ, মনন, নিদিধ্যাসনের কথা বলা হয়েছে। শাস্ত্র বাক্যের অনুধাবনকে বলে **শ্রবণ**, শাস্ত্র বাক্যের যুক্তিপূর্ণ বিচার সঠিক অর্থ গ্রহণে ও অর্থ উপর দৃঢ়বিশ্বাস স্থাপন **মনন**। আর **নিদিধ্যাসন** হল যোগ ও সাধনার দ্বারা নিরন্তর ধ্যান। এই তিনটি স্তরের দ্বারা মিথ্যাজ্ঞান দুর হয় ও আত্মপোলব্ধি হয়।

**শিক্ষাক্ষেত্রে ন্যায় দর্শনের গুরুত্ব**

শিক্ষাক্ষেত্রে ন্যায় দর্শনের গুরুত্ব শিক্ষার বিভিন্ন দিকের উপর প্রভাব ফেলেছে এবং এইগুলি নিম্নে আলোচনা করা হল :

(i) যুক্তিপূর্ণ চিন্তন তীক্ষ্ণ সমালোচনা, কারণ বিশ্লেষণ, ব্যাথা ও দুঃখের নিবৃতি, জীবনের বিভিন্ন সমস্যার সমাধান প্রভৃতি শিক্ষার লক্ষ্য হওয়া উচিত বলে ন্যায় দর্শন মনে করে।

(ii) ন্যায় দর্শন শিক্ষাদানের জন্য প্রত্যক্ষণ, আবৃত্তি, উপমান, বিশ্লেষণ বক্তৃতা, ধ্যান, যুক্তি খোঁজা প্রভৃতি মাধ্যমকে গুরুত্ব দেয়।

(iii) ন্যায় দর্শনে যেসব পাঠক্রম থাকা উচিত বলে মনে করা হয় - সেগুলি হল ভাষা, ধর্মতত্ত্ব, মোক্ষ, যুক্তি, বিভিন্ন পদ্ধতি প্রভৃতি।

(iv) আধুনিক শিক্ষা পদ্ধতির অনেকক্ষেত্রে ন্যায় দর্শনের প্রতিফলন লক্ষ্য করা যায়। যেমন - বর্তমানে সেমিনার, ওয়ার্কশপ, বিতর্কসভা, আলোচনা সভা প্রভৃতি দ্বারা অনেক জটিল বিষয় শিক্ষার্থীদের সামনে তুলে ধরা সম্ভব হচ্ছে। বর্তমানে এগুলির মাধ্যমে শিক্ষক, শিক্ষার্থীর গ্রহণ ক্ষমতা, মন ও মস্তিষ্কের সক্রিয়তাকে তরান্বিত করতে সম্ভব হচ্ছে।

(v) ন্যায় দর্শনে আত্মশৃঙ্খলা, স্বাধীনতা, মোক্ষ লাভ যাতে সহজ হয় সেদিকে লক্ষ্য দেওয়ার কথা বলা হয়েছে যা শিক্ষাক্ষেত্রে অনেকাংশে প্রাসঙ্গিক।

(vi) বর্তমানের শিক্ষাক্ষেত্রে ন্যায় দর্শনের প্রাসঙ্গিকতায় বলা হয় ন্যায় মতে যেমন কোন কিছু সম্বন্ধে জানতে হলে সেই মত কোন বস্তু বা পদার্থকে জানা অত্যন্ত জরুরী ঠিক তেমনি আধুনিক শিক্ষায় দেখা যায় — উদ্ভিদবিদ্যা, জীবনবিদ্যা, রসায়ণ, গণিত, ভাষা, সাহিত্য ইত্যাদি সব বিষয়কে জানার ক্ষেত্রে প্রতিটি বিষয়গুলিকে তাত্ত্বিক ও ব্যবহারিক দিকগুলিকে পাঠ্যসূচীতে অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে।

(vii) অনুশীলনের মাধ্যমে বুদ্ধিকে সঠিক পথে চালনা করাই হল ন্যায় দর্শনের মূল লক্ষ্য। ন্যায় দর্শনে বলা হয় — বুদ্ধি, যুক্তি ও মানসিক ক্ষমতার মাধ্যমে যে শিক্ষা লাভ করা যায় সেই শিক্ষাই হল প্রকৃত শিক্ষা। আধুনিক শিক্ষা পদ্ধতির অনেক ক্ষেত্রে ন্যায় দর্শনের প্রতিফলন লক্ষ্যণীয়।

(viii) সর্বোপরি শিক্ষাক্ষেত্রে শিক্ষার শিক্ষার্থী সুসম্পর্ক স্থাপনের উপর ন্যায়দর্শন এবং আধুনিক শিক্ষাবিজ্ঞান-উভয়েই যথেষ্ট গুরুত্ব দিয়ে থাকে। সুতরাং শিক্ষাক্ষেত্রে ন্যায় দর্শনের গুরুত্ব যে অসীম তা বলার অপেক্ষা রাখে না।

**মন্তব্য**

ন্যায় দর্শনকে একটু অনুধাবন করলে আধুনিক শিক্ষাতত্ত্ব ও প্রয়োগের দিক যথেষ্ট উপকৃত হতে পারে। জ্ঞানমূলক তত্ত্বগুলির সুশৃঙ্খল বিন্যাস, বুদ্ধি ও চিন্তার স্বাধীনতা, বিভিন্ন বিষয় সম্পর্কে প্রকৃত জ্ঞানই আত্মমুক্তির উপায়। বিচার বিশ্লেষনের মধ্য দিয়ে জ্ঞানের অনুসন্ধান, জ্ঞান সাম্রজ্য গড়ে তোলা ইত্যাদি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ দিক। শিক্ষায় ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যবাদ, বিচার বুদ্ধি চর্চাই শেষ কথা নয়, নিরন্তর মননশীলতা মানুষের লক্ষণ, কারণ — মননেই মানুষ বাঁচে। কিন্তু আধুনিক চিন্তার লক্ষ্য ব্যক্তি ও সমাজের সর্বাঙ্গীন বিকাশ। তাইন মনন যেমন সত্য ব্যক্তির সর্বার্থক বিকাশও সত্য হওয়া উচিত। ন্যায়দর্শন অত্যন্ত মনস্তাত্ত্বিক ও বৈজ্ঞানিক উপায়ে জ্ঞান চর্চা করলেও এর একটি ত্রুটি উল্লেখ প্রয়োজন তাহল এই দর্শন শাখা শিক্ষার্থীর শুধু জ্ঞানের দিক বা বৌদ্ধিক দিক উন্নত করতে চায়।